মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে
সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা

সারা যাকের নাজমুন নাহার সাকি মফিদুল হক

প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী

মৃত্যুহীন প্রাণ : নৌফেল মারা যায় না

গত ৩ ডিসেম্বর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশী প্রামাণ্যচিত্রকর নাদিম ইকবাল নির্মিত 'মৃত্যুহীন প্রাণ : নৌফেল মারা যায় না' চলচ্চিত্রের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার। এর আগে জার্মানিতে ও আমেরিকায় প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছে। চলচ্চিত্রটিতে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ইউওটিসি (বর্তমানে বিএনসিসি) ক্যাডেট ল্যান্স কর্পোরাল বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মেজবাউদ্দিন নৌফেল-এর বীরত্ব ও ত্যাগের অনবদ্য ইতিহাস উঠে এসেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, শহিদ নৌফেলের বোন নাজমুন নাহার সাকি, প্রামাণ্যচিত্রের সংগীত পরিচালক শাখাওয়াত হোসেন সাগর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ট্রাস্টি মফিদুল হক, বিএনসিসির সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাহিদুল ইসলাম খান এবং ঢাকা মহানগরী বিএনসিসির নবীন-নবীনা সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের বলেন 'বিজয়ের মাসের এই দিনে প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শন করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। নৌফেল যে বয়সে বিএনসিসির সদস্য ছিলো এবং যে বয়সে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে, আজকে আমরা কল্পনাও করতে পারি না এই বয়সের একটি ছেলে বা মেয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে যাবে। বাংলাদেশের জন্ম হতে গিয়ে কতো তরুণ প্রাণ যে ঝরে গেছে সেটা আমরা ভাবতে ও করতে পারবো না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য শহিদ নৌফেলের পরিবার ও বিএনসিসি প্রতি আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ।'

শহিদ নৌফেলের বোন নাজমুন নাহার সাকি বলেন– 'নৌফেলরা মরে না। কারণ যারা মুক্তিযুদ্ধ করে শহিদ হয়েছেন, তাদের অনেককেই আমরা চিনি না জানি না, নৌফেল হচ্ছে তাদেরই এক প্রতীক। আমি চাইবো শহিদ নৌফেলের স্মৃতি যেভাবে উঠে এসেছে সেভাবে প্রতিটি শহিদের স্মৃতি মানুষের সামনে উঠে আসুক। এই কাজে বিএনসিসির সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাহিদুল ইসলাম খানের ভুমিকা না বললেই নয়। এই ছবির নির্মাতা নাদিম ইকবাল বিএনসিসির অনুষ্ঠানে গিয়েই নৌফেল সম্পর্কে

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ আলোচনা : ৯ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস

গত ৯ ডিসেম্বর সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও নিরোধ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে বিশেষ বক্তৃতা ও নাটক প্রদর্শিত হয়। গণহত্যা সীমাহীন বর্বরতার অতিক্রমণকারী একটি অন্যতম আন্তর্জাতিক অপরাধ। একটি দেশের নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতিগত বা সংস্কৃতিগত কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে ধ্বংস করার বিশেষ উদ্দেশ্যে কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বিচারে হত্যা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, জোরপূর্বক স্থানান্তরসহ যে নানান অত্যাচার চালায় তা গণহত্যা বলে পরিচিত। গণহত্যার নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার ব্যাপ্তি ও মাত্রার কথা বিবেচনায় রেখে জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে গণহত্যার বিচার, গণহত্যা রোধ তথা এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি স্বরূপ একে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে একটি চুক্তি করে যা জেনোসাইড কনভেনশন নামে পরিচিত। গণহত্যা কনভেনশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বের সকল গণহত্যার শিকার ও নিহত ব্যক্তির স্মরণে তথা গণহত্যা উত্তরজীবীদের সম্মানে প্রতি বছর জাতিসংঘ ৯ ডিসেম্বর দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। উক্ত অনুষ্ঠানের অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর মেমোরিয়াল মিউজিয়ামস ইন রিমেম্বারেন্স অব দ্য ভিক্টিমস অব পাবলিক ক্রাইমস (আইসিমেমো) এর সাবেক চেয়ারপার্সন ওফেলিয়া লিয়ঁ। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হিসেবে ১৯৭১ সালে সৈয়দপুরে হানাদার বাহিনীর বর্বরতার স্মৃতিচারণের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "শত শত নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যার জন্যে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করে একের পর এক জবাই করা হয়। মানুষগুলো চিৎকার করে বলেছিল "তোমরা দয়া করে আমাদের গুলি করে মারো তবু জবাই করো না", উত্তরে পাক মিলিটারিরা বলেছিল,

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

ভারতীয় চিত্র-সাংবাদিকের ক্যামেরায় মুক্তিযুদ্ধ

পশ্চিম বাংলার খ্যাতমান আলোকচিত্র-সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত-র ধারণকৃত মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ আলোকচিত্র নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চিত্রলিপি' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত এ আলোকচিত্র প্রদর্শনী ১১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২, রবিবার বাদে প্রতিদিন আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহিদ-জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন পশ্চিম বাংলার আলোকচিত্র সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতীয় দূতাবাসের ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের (আইজিসিসি) পরিচালক মৃন্ময় চক্রবর্তী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে অনেক ব্যাথা, অনেক চোখের জল, অনেক যন্ত্রণা আছে; তবু মুক্তিযুদ্ধকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেকোনো বিষয় আনন্দ দেয়। বীর মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, তরুণ আলোকচিত্র-সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত জীবনের পরোয়া না করে রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে ক্যামেরা হাতে ছুটে বেড়িয়েছেন। ভেতরের তাড়না থেকে তিনি এই কাজ করেছেন।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য ছবি উল্লেখ্য করে তিনি বলেন, লিখিত ইতিহাস পরিবর্তন হয়, শাসকগোষ্ঠী ইতিহাস পরিবর্তন করে কিন্তু ছবি পরিবর্তন করা যায় না। অভিজিৎ দাশগুপ্তের তোলা ছবি ইতিহাসের কথা বলছে, এই ছবিগুলোর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে।'

অতিথির বক্তব্যে অভিজিৎ দাশগুপ্ত বলেন 'অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয় ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে। ২৮ মার্চ আমি যশোর যাই। তারপর খুলনা থেকে রাজশাহী যাই। রাজশাহীতে মোহাম্মদ আলী কামাল নামে যে মুক্তিযোদ্ধা আমাকে নিয়ে ঘুরিয়েছিলেন তিনি আজ এখানে এসেছেন। তিনি আমাকে খুঁজে বের করেছেন। তার জিপে করে আমি গিয়েছিলাম।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

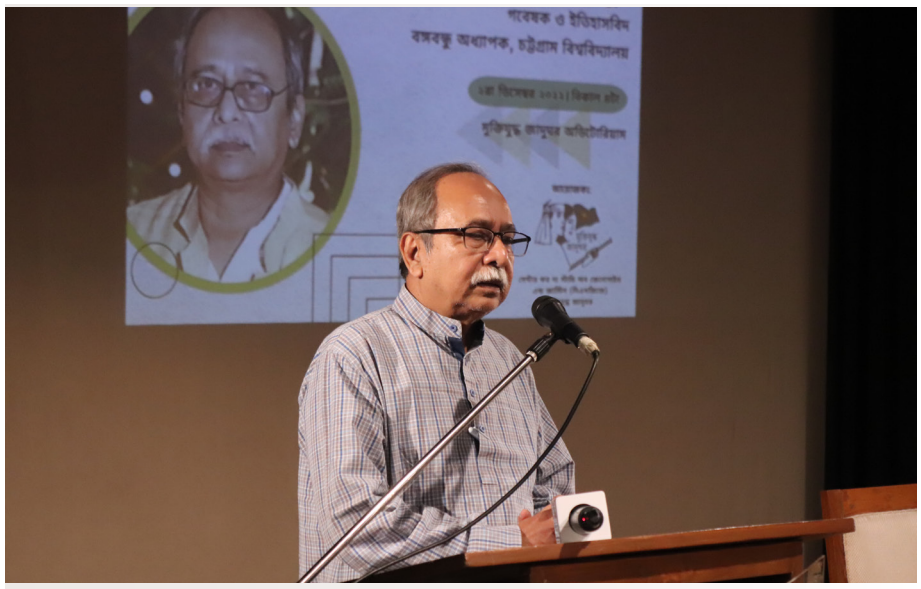

বধ্যভূমি অনুসন্ধান ও গণহত্যা গবেষণা বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

সিএসজিজে মাসিক বক্তৃতামালা : ৫ম পর্ব

গত ২ ডিসেম্বর সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে আয়োজিত হয় মাসিক বক্তৃতামালার ৫ম পর্ব। এই পর্বে 'বধ্যভূমির অনুসন্ধান ও গণহত্যা গবেষণা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন গবেষক ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন।

ড. মুনতাসীর মামুন তাঁর বক্তব্যের সূচনালগ্নে আলোচনা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কে। তাঁর মতে, মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বললে এতে বিজয়ের আবেগ বেশি ফুটে উঠে- কারণ এতে জনগণের অবদান প্রকাশ পায়। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সব সামরিক বাহিনীকে পদক দেয়া হয় আর সাধারণ জনগণ আবার ফিরে যায় মাঠেঘাটে কাজ করতে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর ছয়বার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা করা হয়, যা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টিকে হাস্যকর করে তুলেছে। তিনি পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকার বাহিনী নিয়ে গবেষণা করেন মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা আরো ভালো করে বুঝতে পারার জন্যে। তাঁর মতে কোনো সেক্টর কমান্ডারের নাম কী ছিল তা জানার চেয়ে ৩০ লক্ষ কেনো শহীদ হয় তা জানতে পারাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, জিয়া বা এরশাদের সময়কালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়ে উঠেনি মূলত তাঁদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ছিলো না বলে। তাঁর মতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধেরই একটি অংশ। তিনি ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করা নিয়ে তাঁর উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন, যেখানে তাঁকে সাহায্য করেন তৎকালীন সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদ। ড. মুনতাসীর মামুন বলেন, গণহত্যা নিয়ে না ভাবলে বা গণহত্যা নিয়ে গবেষণা না করলে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব নয়। এর পাশাপাশি দরকার একটি গণহত্যা জাদুঘর। যশোর রোডের নাম নিয়ে তিনি আলোচনা করেন, যার নাম আগে ছিল সবুর খানের নামে; যিনি ছিলেন একজন ঘোষিত রাজাকার। ড. মুনতাসীর মামুন কত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এই রাস্তার নাম পরিবর্তন করেন সেই অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্ত করেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার পর তিনি বুঝতে পারেন যে, জাদুঘরটি যশোরেই হওয়া দরকার। এরপর তিনি গণহত্যা জাদুঘরটি নির্মাণে তাঁর সকল বাধা-বিপত্তির কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, গণহত্যার সাথে নির্যাতনশালা, বধ্যভূমি এবং গণকবর ওতঃপ্রতভাবে জড়িত। ১৯৭১ সালকে বুঝতে হলে শুধু যুদ্ধ নয় বরং এর সাথে থাকা হাহাকার ও বেদনাকেও অনুভব করতে হবে, এই বলে তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি এবং সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হকের সমাপনী বক্তৃতার মাধ্যমে শেষ হয় সিএসজিজে মাসিক বক্তৃতামালার ৫ম পর্বটি।

জাহিদ-উল ইসলাম, গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ সূচনা-অনুষ্ঠান

গত ১৯ নভেম্বর ২০২২ শনিবার বিকেল চারটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা, বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি প্রয়াত আলী যাকেরের স্মৃতি বহমান রাখতে 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ'-এর উদ্বোধন এবং গ্রন্থাগারসমূহে বই প্রদান-অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই উদ্যোগে সহায়তা করছে মঙ্গলদীপ ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠানে কর্মসূচিভুক্ত প্রত্যেক গ্রন্থাগারের প্রতিনিধির হাতে নির্বাচিত বইসমূহ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি, ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি মফিদুল হক, আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ-এর সমন্বয়ক মো. শাহ নেওয়াজ ও আলী যাকের-এর পরিবারের পক্ষে পুত্র ইরেশ যাকের এবং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পাঠাগারের প্রতিনিধিরা। আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, এই উদ্যোগকে আমরা সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাই। পাঠাগার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমরা একে অন্যের অংশী। ডা. সারওয়ার আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে অতীতকে স্মরণ করা, নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পৌঁছে দেয়া। বই তিনটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা ঘটনা জানা যাবে। মফিদুল হক বলেন, আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠের উদ্যোগের

মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা দিক উন্মোচিত হবে বলে আশা রাখি। ইরেশ যাকের বলেন, বর্তমান প্রজন্মের যারা পাঠাগার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ও বই পড়ে তারাই এই প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আরো জানতে পারবে। মো. শাহনেওয়াজ বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকেরকে নতুন প্রজন্মের পাঠকের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া যাবে। ঢাকা মহানগর ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি জেলার ৫০টি বেসরকারি পাঠাগারের হাতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য তিনটি বইয়ের পাঁচটি করে সেট তুলে দেয়া হয়।

নির্বাচিত গ্রন্থসমূহ : স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত 'আমার বন্ধু রাশেদ', কলেজ পর্যায়ে আলী যাকের-এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'সেই অরুণোদয় থেকে' এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক রচিত 'একাত্তর : করতলে ছিন্নমাথা'। বই-পাঠান্তে প্রত্যেকে উক্ত বই সম্পর্কে স্বীয় মূল্যায়ন লিখে জমা দেবে। জাতীয়ভাবে গঠিত বিচারকমণ্ডলী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতি বিভাগে সেরা দশ পাঠক নির্বাচন করবে এবং তাদের পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পাঠককে সনদ প্রদান করা হবে।

আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন বিষয়ক সেমিনারে সিএসজিজের গবেষকদের অংশগ্রহণ

গত ২৯ নভেম্বর ২০২২ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস এবং অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে 'ইন্টারন্যাশনাল রিফিউজি রেজিম অ্যান্ড নন-সিগনেটরি স্টেটস' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক অভিবাসন আইনের অধ্যাপক মায়া জানমেয়ার ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক মায়া তাঁর প্রবন্ধে রিফিউজি বা শরণার্থী বিষয়ে গবেষণায় পশ্চিমা আধিপত্যের পক্ষপাতিত্বমূলক অবস্থানকে সমালোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশনে স্বাক্ষর না করা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্য কীভাবে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ব্যবহারিক আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন ব্যবস্থার বিকাশে অবদান রেখেছে। তিনি বলেন যে, অ-স্বাক্ষরকারী হওয়ার কারণগুলি দেশভেদে পরিবর্তিত হয় এবং দেশীয় রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সবচেয়ে সাধারণ কিছু কারণ। ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন অ-স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোতো ইউএনএইচসিআর একটি বিকল্প সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করে শরণার্থীদের সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সেমিনারে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিসের গবেষণা ফেলো ড. এম সঞ্জীব হোসেন। তিনি বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সঙ্কট এবং এই ব্যাপক শরণার্থী দুর্যোগে পশ্চিমারা কীভাবে সাড়া দিচ্ছে সে বিষয়ে কতক গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ তুলে ধরেন। তিনি নীতিনির্ধারণ ও সাহায্য বিতরণ ইস্যুতে পশ্চিমা দেশগুলোর বৈপরীত্যমূলক অবস্থানের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ১০ লাখ রোহিঙ্গার ব্যক্তিগত তথ্য কোনো আইনি ভিত্তি ছাড়াই সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, এই ধরনের উদ্যোগ পশ্চিমা দেশে এত সহজে নেওয়া সম্ভব কি না।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সিএসজিজের পক্ষ থেকে গবেষক তামান্না ইসলাম, মো. হাসিব চৌধুরী, ফয়সাল শাহরিয়ার রাতুল এবং ইমরান আজাদ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ফয়সাল শাহরিয়ার রাতুল
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ফেলোশিপ কার্যক্রমের যাত্রা শুরু

মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয় মূলত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অপরিসীম অবদানের কারণে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন করোনা আক্রান্ত অবস্থায় জিয়াউদ্দিন তারিক আলী দেহত্যাগ করেন। জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসায়েন্সের যৌথ আয়োজনে ১লা ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে আরম্ভ হয়েছে গণ-নৃশংসতা অপরাধের অধ্যয়ন, স্মৃতিচারণ এবং ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে এর প্রতিরোধের বিষয়কে কেন্দ্র করে 'জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ফেলোশিপ ২০২২-২৩'-এর যাত্রা। এই আয়োজনে বাংলাদেশ-কম্বোডিয়া জেনোসাইড বিষয়ে তুলনামূলক গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফেলোশিপটির প্রথম পর্বের গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে ইভনাত ভূঁইয়া ও তাবাসসুম নিগার ঐশীকে।

ইভনাত ভূঁইয়া গবেষণার বিষয় সম্পর্কে বলেন, 'গণহত্যা বিষয়ক গবেষণার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি এবং তরুণ গবেষকদের গণহত্যা নিয়ে চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কন্সায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ফেলোশিপ ২০২২-২০২৩-এর একজন নির্বাচিত রিসার্চ ফেলো হিসেবে মনোনীত হতে পেরে আমি আনন্দিত।' তিনি আরও বলেন, 'এই ফেলোশিপের মাধ্যমে আমার গবেষণায় ১৯৭৫-১৯৭৯ সালে সংঘটিত কম্বোডিয়ান গণহত্যা এবং ১৯৭১ সালের নৃশংস বাংলাদেশ গণহত্যায় বেসামরিক জনগণের উপর করা যৌন নির্যাতন ও লিঙ্গ ভিত্তিক অত্যাচারের বিষয়টি যে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি তা আলোকপাত করার চেষ্টা করব। বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া উভয় গণহত্যায় সংঘটিত যৌন নির্যাতনের ধরণ, এটি কীভাবে উক্ত দেশ দুটির তৎকালীন সমাজ নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, উভয় দেশের বিচারিক ব্যবস্থা যৌন নির্যাতনের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধটিকে তাদের রায়ে কোন প্রেক্ষাপট হতে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কতটুক করেছেন বা আদৌ করেছেন কিনা ইত্যাদি আমার এ গবেষণায় তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে। আন্তর্জাতিক আইনের একাডেমিক জগতে গণহত্যার প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন নিয়ে আরো বেশি আলোচনার প্রয়োজন বলে মনে করি।'

তাবাসসুম নিগার ঐশী, একজন তরুণ গবেষক, তিনি 'বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়ার নৃশংসতা অপরাধের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ট্রানজিশনাল জাস্টিসের ভূমিকা'র উপর গবেষণা করছেন এই ফেলোশিপে। বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়া, আজ অবধি ১৯৭০ এর দশকে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার অপরাধের জন্য ন্যায়-বিচার দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে, ঐশীর গবেষণার একটি মূল দিক হলো দুই দেশের সরকার, এই নির্মম গণহত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার, পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্থদের বিধ্বস্ত জীবনের পুনর্গঠনের জন্য যে অন্তর্বর্তীকালীন বিচার পদ্ধতি বা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এবং তা কতটা ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করেছে - তা অনুসন্ধান করা। তা এছাড়াও, ঐশীর গবেষণার আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ হলো:- (ক) বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়ার গণহত্যার কোন কারণগুলি উভয় দেশে বিচার বিলম্বের কারণ হতে পারে, তা খুঁজে বের করা; এবং (খ) সংঘটিত অপরাধের জবাবদিহিতার জন্য বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার সত্য ও সমঝোতা বাস্তবায়ন করা উদ্যোগগুলোর কোনো তাৎপর্য রয়েছে কি না, তাও সন্ধান করা।

তিন মাসব্যাপী এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামটিতে প্রথম এক মাস ফেলোরা একজন সিনিয়র মেন্টরের অধীনে বাংলাদেশে থেকে একটি গবেষণা প্রস্তাব তৈরি করবেন, গবেষণা পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবেন এবং দুই দেশের ঐতিহাসিক বিষয় ও কম্বোডিয়ান গণহত্যার পটভূমি ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিটারেচার রিভিউ করবেন। পরবর্তীকালে ফেলোরা কম্বোডিয়াতে ৪৫ দিনের জন্য মাঠ গবেষণা পরিচালনা করবেন যার আয়োজক সংস্থা হল ইয়ুথ ফর পিস। বাংলাদেশে ফেরার পর ফেলোরা তাদের ফেলোশিপের থিমের উপর একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন।

ইভনাত ভূঁইয়া ও তাবাসসুম নিগার ঐশী

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সিএসজিজে স্বেচ্ছাকর্মীদের সভা

গত ২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-র স্বেচ্ছাকর্মীদের শীতকালীন মিলনমেলা ও আলোচনা সভা। এই মিলনমেলার এজেন্ডা ছিল সিএসজিজের কাজের সাথে স্বেচ্ছাকর্মীদের সম্পৃক্ততা বেগবানকরণে পন্থা নির্ধারণ এবং পুরানো ও নতুন স্বেচ্ছাকর্মীদের অংশগ্রহণে ভবিষ্যতের গবেষণা কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা করা। অনুষ্ঠানের শুরুতে সিএসজিজের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ আগত সকলকে স্বাগত জানান এবং এরপর তিনি সিএসজিজের বর্তমান ও আসন্ন কিছু কার্যকলাপ যেমন: ২০২৩-এর জানুয়ারিতে উইন্টার স্কুল আয়োজন, ইন্টার্নশিপসহ সিএসজিজের সাথে সংযুক্ত হওয়ার নানাবিধ সুযোগ নিয়ে আলোকপাত করেন। মানুষের কাছে সিএসজিজের কার্যকলাপ ও অবদান তুলে ধরার জন্য স্বেচ্ছাসেবীরা বিভিন্ন পরামর্শ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে সমন্বয়সাধন, মিডিয়ায় প্রচারণা বৃদ্ধি, ছোট ভিডিও ক্লিপ তৈরি, দর্শক আকৃষ্ট করার মতো ভেন্যু নির্ধারণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীরা এই মিলনমেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে সমাপনী বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক। তিনি সিএসজিজে-র বিকশিত হবার পেছনে স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এভাবেই পাশে থেকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস সকলের কাছে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

নুসাইবা জাহান, গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

'মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি'
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যের ভাণ্ডার হয়ে ওঠা এবং সেইসব তথ্য সর্বজনের সামনে মেলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য থেকে ১৯৯৮ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে ৮২৯টি বইয়ের বিবরণী নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের বই' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, বর্তমান সভাপতি, ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সংকলন ও সম্পাদনায় ৪০০৪টি বইয়ের তালিকা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি', দু'বছরের ব্যবধানে ২০১৪ সালে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, যেখানে ছিল ৪৬৬০টি বইয়ের তালিকা। ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ৭৬৪২টি গ্রন্থে তালিকা নিয়ে ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের সংকলন ও সম্পাদনায় 'মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি'-র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো ২০২২-এর নভেম্বরে। গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইসমূহ ১৪টি বিষয় ভিত্তিক বিভাজনে বিন্যস্ত করা হয়েছে, এর সাথে যুক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে সকল উচ্চতর গবেষণা হয়েছে তার তালিকা। 'মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি' সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে।

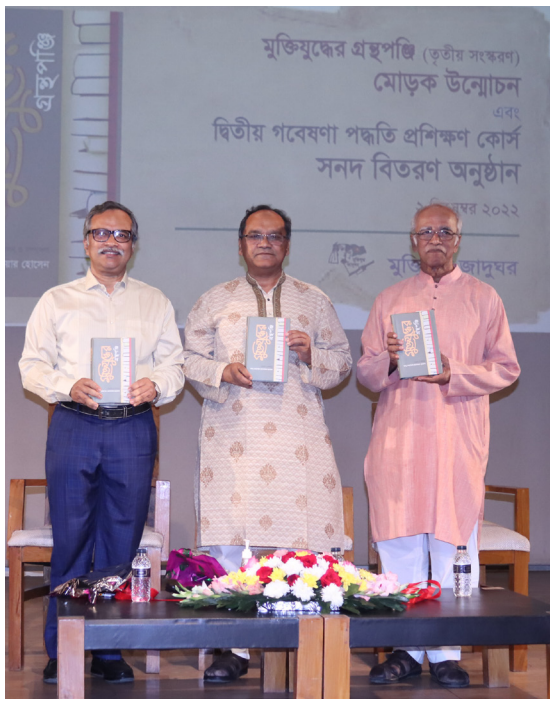

দ্বিতীয় গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ

স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স ৫১ বছর, কিন্তু এখনও বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই দায়িত্ব পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত দ্বিতীয় গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিচালক ড. আবু মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। ২ ডিসেম্বর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি তরুণ গবেষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান প্রজন্ম প্রশিক্ষণ নিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত হতে পারছেন, কিন্তু তাদের প্রজন্মকে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হয়ে শিখতে হয়েছে হাতে কলমে। তিনি বলেন তরুণ গবেষকদের বিশেষভাবে খুঁজতে হবে মুক্তিযুদ্ধের কোন কোন দিক এখনো অনালোচিত রয়ে গেছে এবং সেই ক্ষেত্রগুলোতে তাদের কাজ করতে হবে, এজন্য প্রয়োজন হবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে পড়াশোনা করা, এক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করে মানসম্মত ক্ষেত্র বেছে নিতে হবে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের নানান স্মারক এখনও সারা দেশে ছড়িয়ে আছে, যারা এই কোর্সটিতে অংশ নিয়েছেন তারা নিজ নিজ অঞ্চলে এধরণের স্মারকের অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করলে বড়ো দায়িত্ব পালন করা হবে। কোর্সের প্রশিক্ষক হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম বলেন বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে কোর্সটির আয়োজন করে তার পরিসরটি বড়ো এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তরুণদের জন্য যে প্লাটফর্ম তৈরি করছে সেই সুযোগটি তাদের গ্রহণ করা প্রয়োজন পূর্ণ মাত্রায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর নিয়মিত এই আয়োজন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সে তরুণদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেন, কোর্সটি তরুণ গবেষকদের মধ্যে গবেষণা বিষয়ে নতুন ভাবনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে প্রশিক্ষণ সমাপনীতে যে গবেষণা প্রস্তাবনা অংশগ্রহণকারীরা জমা দিয়েছেন তার বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রত্যেক তরুণ গবেষকই প্রস্তাবিত শিরোনাম নিয়ে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাবেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৪৫জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে গত ১৪ অক্টোবর শুরু হওয়া কোর্সটির সমাপ্তি ঘটে ১২ নভেম্বর। ২ ডিসেম্বর ২০২২ কোর্স সমাপনকারী ৪৩জন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়।

মু|ক্তি|যো|দ্ধা|র || ভা|ষ্য

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম ফজলুল হক

১৯৭১ সালে জামালপুর মহকুমার সরিষাবাড়ি থানার পোগলদীঘা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধের আগে আগে আমরা স্কুলমাঠে আনসার মুজাহিদদের কাছে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করি। আমাদের প্রশিক্ষক ছিলেন ওয়াসিম উদ্দীন নামক একজন মুজাহিদ। সম্ভবত ২৯ মার্চ ময়মনসিংহ ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে একটা গ্রুপ ট্রেনে করে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে দেড় মাইল দূরে যমুনার পূর্বপাড়ে দৌলতপুর গ্রামে ডিফেন্স নেয়। আমাদের দায়িত্ব ছিল তাদেরকে বাংকার তৈরিতে সহযোগিতা করা। তাদের লক্ষ্য ছিল পাকবাহিনী এলে তাদের প্রতিহত করা। আমরা ২৫-৩০ জন ছাত্র ইপিআর-এর সেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করি। ইপিআর কমান্ডার ছিলেন সুবেদার রৌফ এবং আরও দুজন হাবিলদার ছিলেন– আবুল কাশেম ও আব্দুল মালেক। ২ এপ্রিল হঠাৎ পাকবাহিনী জেট বিমানযোগে বোমা হামলা শুরু করলো এবং খবর আসলো পাকবাহিনী জামালপুর থেকে সরিষাবাড়ি হয়ে ট্রেনযোগে এগিয়ে আসছে। ইপিআরের কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্র থাকলেও গোলাবারুদ ছিল না বিধায় তারা শেষ পর্যন্ত ডিফেন্স করার সিদ্ধান্ত পরিহার করলো। ওরা আমাদের সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলে সবাই চলে গেলো, থেকে গেলাম আমি, আমার চাচাতোভাই আব্দুল গনি। ইপিআর নৌকাযোগে সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিরাজগঞ্জের চরের দিকে রওনা দিলে আমরা দুইভাই তাদের সাথে চলে গেলাম। আমরা উঠলাম কাজীপুরের মেম্বার বাড়িতে। আমাদের লক্ষ্য ভারতে যাওয়া, কিন্তু যমুনা নদী ছিল অরক্ষিত। ফুলছড়ি ও বাহাদুরাবাদঘাটে ছিল পাকবাহিনীর শক্ত পজিশন তাই আমরা পায়ে হেঁটে লোকালয়ের ভেতর দিয়ে ৭ এপ্রিল হিলি বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলাম। আমরা দুই ভাই প্রথমে শরণার্থী শিবিরে নাম লেখালাম। ২০ এপ্রিল শরণার্থী শিবিরে ঘোষণা হলো মুক্তিযোদ্ধা নাম নিবন্ধনের জন্য। পাশেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা ক্যাম্প। এখানে পেয়ে গেলাম আমাদের পাশের বাড়ির আজিজ ভাইকে। তিনি থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য। ২১ তারিখ আমরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখালাম। কামারপাড়া ইয়ুথক্যাম্প হয়ে আমরা রায়গঞ্জ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গেলাম। লে. তাশিরাম ডুগরা উইং কমান্ডার, ওস্তাদ ছিলেন রানা থাপা ও রঞ্জিত কুমার। আরও ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের আব্দুল গনী এবং ইপিআরের আব্দুল আউয়াল। এদের কাছে ২৮ দিনের ট্রেনিং নিয়ে মালদহ'র চানমারী আমবাগানে একটা ক্যাম্পে যাই। সেখান থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের তরঙ্গপুর ক্যাম্প ৭নং সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন এমএন হুদা সাহেবকে পেলাম। সেখান থেকে ছোপড়া অপারেশন ক্যাম্প। শুরু হলো হিট অ্যান্ড রান কায়দায় যুদ্ধ। এরপর শিলিগুড়ি পানিঘাটায় নিয়ে যাওয়া হলো অ্যাডভান্স ট্রেনিং। প্রথম ব্যাচে আমরা বাইশ শত মুক্তিযোদ্ধা এক মাসের প্রশিক্ষণ নিলাম। এফএফ টেনিং শেষে ২ আগস্ট আমাকে নিয়ে আসা হলো তরঙ্গপুর। ৪ আগস্ট আমাদেরকে আর্মস এমুনেশন দিয়ে চাপাইনবাগঞ্জ ভোলাহাট দিয়ে দেশের ভিতর আবার ঢুকিয়ে দেয়া হলো। ১৪ আগস্ট লিবারেশন ওয়ার ফোর্সের পোশাক দেয়া হলো। পরে একটা ফুল কোম্পনির সাথে আমরা কালীগঞ্জ-ধুপরি হয়ে চলে এলাম মাইনকারচর বিএসএফ ক্যাম্প। সেখানে সেক্টর কমান্ডার মেজর তাহের এলেন আমাদেরকে কামারপুর যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের কমান্ডার আক্তার সাব ছিলেন সিরাজগঞ্জের, তিনি কামারপুর যাবেন না, যাবেন কাজীপুর। নৌকারঘাটে দেখা হয়ে গেলো আমার এলাকার গুলজার ভাই, সফের আলী, চন্দনের সাথে। ওদের কমান্ডার ছিল হাকিম সাব। পরে অনেক দেনদরবার করে আমি এলাকার লোকের সাথে চলে এলাম। নতুন কোম্পানির সাথে ২৫ সেপ্টেম্বর উত্তর টাঙ্গাইলের সোনামুখী নামক জায়গায় জঙ্গলের ভিতর অবস্থান নিলাম। এরপর আমাদের কোম্পানি ভাগ হয়ে গেলো, আমি চলে গেলাম হুমায়ন বাঙালের কোম্পানিতে। উঠলাম ফুলদয়পাড়া মাস্তান মন্ডলের বাড়ি। আমরা জানতাম না এটা একটা রাজাকারের বাড়ি। পাকবাহিনী আক্রমণ করলো আমাদের উপর। আমি এলএমজি নিয়ে দৌড় দিলাম। ঝোপের মধ্যে এলএমজি নিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার ফায়ারের কারণে বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে গেলো। শহিদ হলো হুমায়ন বাঙালসহ ৬ জন যোদ্ধা এবং ৫০ জনের মতো গ্রামবাসী। তারপর কায়তা গেলাম আমার পূর্ববর্তী কমান্ডার হাকিম সাহেবের কাছে। কাদের সিদ্দীকীর পরামর্শমতে আমরা দুর্ধর্ষ হাকিম কোম্পানি দিনরাত যুদ্ধ শুরু করলাম– গোপালপুর– জামতলী, নবগ্রাম, গুদারাঘাট, ভুয়াপুর– ছয়আনী, ঘাটাইল, কালীহাতি। এরপর সরিষাবাড়ি হরখালী গ্রামে বদিউজ্জামান সাহেবের বাড়িতে ক্যাম্প করলাম, আমার বাড়ি থেকে দুই আড়াই মাইল দূরে। দায়িত্ব অনেক বেশি। একমাইল উত্তরে আমার ভগ্নীপতির বাড়ি। দুলাভাই দেখা করতে এসে জানালেন আমাদের স্কুলের শিক্ষক বিলমাদারিয়া গ্রামের আব্দুল হাই মাস্টার পাকবাহিনীর দালাল হিসেবে উৎপাত করছে খুব। ওই স্যারের বাড়িতে গিয়ে একসময় আমি প্রাইভেট পড়েছি। অন্যদিকে, আমার দুলাভাই আজাহার, কোম্পানি কোমান্ডার হাকিম সাব ও রাজাকার শিক্ষক আব্দুল হাই একই ক্লাসের ছাত্র ছিল। একদিন ভোর বেলায় আমি কালো চাদরের নিচে অস্ত্র ঢাকা দিয়ে বোনের বাড়ি গিয়ে দুলাভাইকে নিয়ে রাজাকার আব্দুল হাই স্যারের কাছে গেলাম। স্যার আমাকে বললেন– পাকিস্তান ভাইঙ্গা বাংলাদেশ বানাবি এতো সোজা না। অমি স্যারকে বললাম, আপনার ব্যাপারে খারাপ রিপোর্ট পাইছি, আপনি আমার শিক্ষাগুরু, দয়াকরে কাল থেকে আপনি কোথাও যাবেন না। বাড়িতে বসে থাকবেন। তারপর ফজরের আজানের সময় চলে আসলাম বোনের বাড়ি। এরমধ্যে আব্দুল হাই বোনের বাড়িতে রাজাকার পাঠালো আমাকে ধরতে। আমি এসএমজি নিয়ে আড়ার মধ্যে গেলাম। বাড়ির সবাইকে পাগাড়ে আড়াল করলাম। দেখি ১২-১৩ রাজাকার, চিনি অনেককে আলাউদ্দীন, চাঁন, লালমিয়া, আমার ক্লাসম্যাট আবুবকর সিদ্দিক রাইফেল হাতে আমারে ধরতে আসছে। আমি এসএমজি দিয়ে মারলাম ব্রাশ। আর একটা গ্রেনেড মারলাম। গুলির আওয়াজে রাজাকারের দৌড় দেখেকে। তারপর দুইটা রাজাকার ধইরা নিলাম ক্যাম্পে। পরে রাজাকার প্রধান আব্দুল হাইকে ধরে আনা হলো। এরপর দিন পাকবাহিনী আমাদেরকে চারদিক দিয়ে ঘেরাও করলো। সারাদিন যুদ্ধ হলো। তারপর পাকবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো। আমাদের ডিফেন্স এতো ভালো ছিল যে একজন মুক্তিযোদ্ধাও শহিদ হয়নি। পরে হামিদ সাব আর সামাদ গামা থ্রি-ইঞ্চ মার্টার সেল মারলো আকাশে। আর কোনো দিন ওই গ্রাম পাকবাহিনি আসেনি। আমরাও কাদের সিদ্দীকীর নির্দেশে ক্যাম্প গুটিয়ে অর্জুনা গ্রামে গেলাম। ভুয়াপুর ছয়ানি তুমুল যুদ্ধ হলো। ২৬ নভেম্বর ঘাটাইল বানিয়াপাড়া ব্রিজ আক্রমণে তুমুল যুদ্ধ হয়, সেইখানে আমি আহত হই। ঘাটাইলের দেওপাড়া গ্রামের শাহজাহান এই যুদ্ধে শহিদ হয়। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের গিয়াস ও শফি আমাকে উদ্ধার করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ভুয়াপুরের রফিকও সেই যুদ্ধে আহত হয়। শহিদ শাহজাহানের লাশ টিকলিপাড়া গ্রামে দাফন করা হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : **শরীফ রেজা মাহমুদ**

শ্রদ্ধাঞ্জলি : শহীদজায়া খায়রুন্নেছা

দীর্ঘদিন ধরে বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না শহীদ রশিদ মিস্ত্রির সহধর্মিনী খায়রুন্নেসা। আসলে বয়সের ভার তাঁকে উঠতে দিত না। বছর দুয়েক আগেও জল্লাদখানায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সবসময় উপস্থিত থাকতেন। স্মৃতিচারণ করতেন নতুন প্রজন্মের সাথে। শোনাতেন তাঁর দুঃখভরা জীবনের গল্প। তাঁর স্বামী শহীদ রশিদ মিস্ত্রীকে হত্যার ঘটনা। জল্লাদখানায় মিরপুর গণহত্যার যে তালিকা আছে তাতে ১৫ নম্বরে রয়েছে শহীদ রশিদ মিস্ত্রীর নাম। শয্যাশায়ী খায়রুন্নেসাকে আমি মাঝে মধ্যে দেখতে যেতাম। আমাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরতেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সবার খোঁজ খবর নিতেন। বলতেন সরকার কি শহীদদের তালিকা করছে? যদি করে আমার স্বামীর নামটা যেন তালিকায় থাকে। তুমি দেখবা। আমি কিছুই বলতে পারতাম না তখন কারণ স্বাধীনতার ৫১ বছরেও গণশহীদের কোনো তালিকা হয়নি। মনের মধ্যে এই কষ্টটা পুষে ২৯ নভেম্বর ভোরবেলায় পৃথিবীর মায়া ছেড়ে অনন্তলোকে যাত্রা করেন খায়রুন্নেসা। তাঁর শেষ যাত্রায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হতে। বাসার নিচে তাঁর নিথর দেহটা পড়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছিল এই দেশটার জন্যে কতকিছু ত্যাগ করেছেন তিনি। মাত্র ২০ বছর বয়সে খায়রুন্নেসার বিয়ে হয় আব্দুর রশীদের সাথে। আব্দুর রশীদ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে পাইপ ফিটার হিসেবে কাজ করতেন। রশীদ মিস্ত্রি হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। কাজের পরিধির জন্য এলাকায় বেশিরভাগ লোকের সাথে পরিচয় ছিল। আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন বলে এলাকার সকলেই জানত। চার সন্তানের জনক ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে দেশের পরিস্থিতি যখন দ্রুত পালটে যেতে থাকে তখন এলাকার অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। রশীদ মিস্ত্রিকেও অনেকেই বলে পালিয়ে যেতে কিন্তু সে তার বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হয় না। মার্চের ২৮ তারিখে রশীদ মিস্ত্রিকে খোঁজার জন্য বিহারিরা তার বাড়িতে যায়। রশীদ মিস্ত্রির বড় মেয়ে গেট খুলে দেখে কয়েকজন বিহারি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি দৌড়ে এসে রশীদ মিস্ত্রিকে বলে 'বাবা, তোমার খোঁজে অনেক লোক এসেছে।' রশীদ মিস্ত্রি বুঝে ফেলে যে, তাকে ধরতে এসেছে বিহারিরা। সে তখন বাড়ির পিছনে ধানখেতের দিকে পালিয়ে যাওয়ার

চেষ্টা করে। কিন্তু বিহারিরা তাকে ধরে ফেলে এবং সেখানে তাকে হত্যা করে। রশীদ মিস্ত্রিকে যখন ধরে নিয়ে যায় তখন খায়রুন্নেসা বাসায় ছিলেন না। তিনি ঐ এলাকায় এক বিহারির বাসায় কাজ করতেন। তিনি বাসায় ফিরে দেখেন বিহারিরা বাসা দখল করে আছে। তিনি বাসা থেকে তাদেরকে চলে যেতে বলেন। দখলকারী বিহারিরা খায়রুন্নেসাকে মেরে বাসার পাশে ড্রেনে ফেলে দেয়। তাকে যখন ড্রেনে ফেলে দেয় সেটা তার মনিবের ছেলে দেখে ফেলে। খায়রুন্নেসা তাদের বাসায় কাজ করতেন বলে তাদের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তারা খায়রুন্নেসাকে বাসায় নিয়ে যায়। খায়রুন্নেসার জ্ঞান ফেরার পর তিনি তার চার সন্তানসহ যে বাসায় কাজ করতেন সেখানে আশ্রয় নেন। প্রায় তিন মাস পর্যন্ত সেখানে ছিলেন তিনি। ছোট ছেলের বয়স তখন ছিল মাত্র ১০ মাস। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। ততদিনে তার বাসা বিহারিরা লণ্ডভণ্ড করে গেছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খায়রুন্নেসা সরকার থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন মাত্র ১,০০০ টাকা। টাকার সাথে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল সেটিও তার ভাগ্যে জুটেনি। বাসা বাড়িতে 'বুয়া' হিসেবে কাজ করে খুব কষ্টে সংসার চালাতেন। এভাবেই তার সন্তানদের বড় করেন তিনি। অল্প বয়সেই একটি সন্তান মারা যায়। ১৯৮০ সালের দিকে অনেক চেষ্টার পর সিটি কর্পোরেশনে ক্লিনার হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন তিনি। বয়সের কারণে পরে অবসরে চলে যান। এরই মধ্যে বাড়ি নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। অন্য একজন জমির মালিক বাড়িটি দাবি করে। শেষ সম্বল পেনশনের টাকাটা দিয়ে উনি জমিটুকু রক্ষা করেন। চোখে ছানি পড়ে গেছে। ৩ সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে মানসিক প্রতিবন্ধী, মেয়েটাও মারা গেছে, একমাত্র নাতনিটা সাথেই থাকে। আরেক ছেলে ড্রাইভার। কিন্তু তার নিজের সংসার এবং ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য সে তার মা খায়রুন্নেসাকে আলাদা করে দেয়। যতদিন শরীরে শক্তি ছিল বাসাবাড়িতে কাজ করেছেন। একটি ঘর ভাড়া দিয়ে কিছু টাকা পেতেন। এভাবেই তিনজনের মাস চলত। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অনেকেই তাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। এভাবেই বেঁচে ছিলেন বৃদ্ধা খায়রুন্নেসা। এখন সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে অনন্তলোকে বাস তাঁর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরম সুহৃদ পরপারে ভালো থাকুন। আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তাঁর প্রতি।

প্রমিলা বিশ্বাস, জল্লাদখানা বধ্যভূমি

শ্রদ্ধাঞ্জলি: ড. মুহম্মদ হায়দার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলা ২৬ বছর আর ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলা ১৮ বছর। এই ১৮ বছরের চলার পথে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে অনেক সুহৃদ যুক্ত হয়ে যান। তেমনই এক সুহৃদ জামালপুরের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ হায়দার যার সাথে পরিচয় সেপ্টেম্বর ২০০৪-এ সরকারি জাহেদা শফি মহিলা কলেজে। সেই থেকে সদা হাস্যোজ্জ্বল লেখক ও গবেষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ হায়দার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক লেখক ও গবেষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ হায়দার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ ভোর সকালে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ২০০৪ থেকে ২০২২ এই ১৮ বছরে নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। কিছুকাল আগে পুনরায় জামালপুরের সাবেক কর্মস্থলে ফিরে এসেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজে আরো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। সর্বশেষ জামালপুর শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লীতে নির্মীয়মাণ 'জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'-এ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। সুহৃদ ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ হায়দারের অকাল প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ভারতীয় চিত্র-সাংবাদিকের ক্যামেরায় মুক্তিযুদ্ধ

১ম পৃষ্ঠার পর

তাকে আমি বলেছিলাম, আমি রাজশাহী শহর দেখতে আসিনি যুদ্ধ দেখতে এসেছি। পরে যেখানে ফায়ারিং হচ্ছে উনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান। আমার আসল শিকড় হচ্ছে বাংলাদেশে। ছোটবেলা থেকে ঢাকার গল্প শুনে বড় হয়েছি। আমার বাড়ি ছিল ওয়ারিতে। সুতরাং বাংলাদেশের
সাথে নাড়ীর টান তো ছিলই। দুভার্গ্যবশত আমার ভালো কালার ছবিগুলো সব চলে গেছে গামা, প্যারিসে। টাইম ম্যাগাজিনসহ আমার যেসব ছবি বেরিয়েছে সেগুলো গামার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গামা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর সে ছবিগুলো কোথায় আছে সেটা আমার জানা নেই। এসব ছবি পাওয়া গেলে আরও পরিষ্কার ইতিহাস তুলে ধরা যাবে।"

সূচনা বক্তব্যে প্রদর্শনীর ও কিউরেটর নকশাকার আমেনা খাতুন প্রদর্শনীর নকশা ও কিউরেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে ভারতীয় দূতাবাসের ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের (আইজিসিসি) পরিচালক মৃন্ময় চক্রবর্তী বলেন ''মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্য দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রাখতে হবে। ভারতের জনগণ মনে করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবেশের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অন্যসব প্রতিবেশির মধ্যে বাংলাদেশ অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আর্দশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে বিশ্বের অনান্য দেশ দুই প্রতিবেশির এ সম্পর্ককে উদাহরণ হিসেবে দেখাতে পারে।''

ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন 'নাফিজ ইমতিয়াজ উদ্দিন, শামীম আহমেদ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি

ডা. সারওয়ার আলীর সূত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে চিত্র সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্তের সংযোগ স্থাপিত হলো, শুরুতেই তাঁদের স্মরণ করছি। চিকিৎসার জন্য ডা. সারওয়ার আলী ভারতে অবস্থান করছেন, আমরা তাঁকে আজ বিশেষভাবে স্মরণ করছি। তিনি আজ শারীরিকভাবে এখানে নেই কিন্তু সর্বক্ষণই আমরা তাঁর ছায়াতলটা অনুভব করছি। একাত্তরে বাংলাদেশের পরম সুহৃদ অভিজিৎ দাশগুপ্ত। তিনি যে তাগিদ থেকে ছবি সংগ্রহ করেছেন, সেই তাগিদ থেকেই 'এক্সোডাস ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ' প্রকাশ করেছেন। এর একটি কপিই তার সংগ্রহে ছিল। এটি জাদুঘরে দেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। গামা এজেন্সির কাছে থাকা ছবিগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগ্রহের চেষ্টা করবে।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

'মুক্তিযুদ্ধের চিত্রলিপি' আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে পাঁচটি পর্বে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ৫২টি দুর্লভ আলোকচিত্র, ৬টি স্মারক ও ৫টি পত্রিকা প্রদর্শিত হচ্ছে।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মুক্তিযুদ্ধের কিছু স্মৃতিময় স্থান

রূপের রাণী পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে ২০১৬ সালের পর দ্বিতীয় বার অক্টোবর-নভেম্বর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত তথ্য সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছে জাদুঘর। এ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নবীন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার সময় স্থানীয়দের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থানের তথ্য জানা যায়। সেই সকল সংগৃহীত স্মৃতিময় স্থানের কিছু তথ্য -

কোর্ট বিল্ডিং (পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড) : ১৯৭১ সালে কোর্ট বিল্ডিং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানী বাহিনী চাকমা রাজার সহযোগিতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহরে প্রবেশ করে এই কোর্ট বিল্ডিং ভবনটি ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করতো। একাত্তরের কোর্ট বিল্ডিং বর্তমানে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড-এর প্রধান কার্যালয়।

ডিসি বাংলো : ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানী বাহিনী চাকমা রাজা ত্রিদীপ রায়ের সহায়তায় চট্টগ্রাম থেকে সড়ক পথে রাণীরহাট হয়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রবেশ করে। শহর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পাকিস্তানী বাহিনী ডিসি বাংলোয় ক্যাম্প স্থাপন করে।

স্টেশন ক্লাব : রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অনান্য অঞ্চলের মতো ২৬ মার্চ থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে মুক্তিযোদ্ধারা। মার্চে শহরের স্টেশন ক্লাব মাঠে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণার্থীরা অস্থায়ী ক্যাম্প গড়ে তোলে। মুক্তিকামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক এইচ টি ইমাম ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবদুল আলী। পাকিস্তানী বাহিনী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহরে প্রবেশের সংবাদ পেয়ে মুক্তিকামী জনতা স্টেশন ক্লাব ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। শহর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর পাকিস্তানী বাহিনী স্টেশন ক্লাবে ক্যাম্প স্থাপন করে।

কোতোয়ালী থানা (তবলছড়ি) : শহরের ডিসি বাংলো, বন বিভাগ বাংলো (উত্তর ও দক্ষিণ), কোর্ট বিল্ডিং ও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশাপাশি কোতোয়ালী থানা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে।

রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় : এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানী বাহিনী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহরে নিয়ন্ত্রণ নেয়। পাকিস্তানী বাহিনী স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সহযোগিতায় রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান নির্যাতন ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্পে শহরের আশপাশের নিরীহ মুক্তিকামী ও শরণার্থীদের ধরে নিয়ে এনে পাশাবিক নির্যাতন করত। এই বিদ্যালয়টি জেলার প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র ছিল।

বন বিভাগ বাংলো : বন বিভাগের বাংলো (উত্তর ও দক্ষিণ) দুইটি পাকিস্তানি অফিসাররা বাসস্থান ও ক্যাম্প

হিসাবে ব্যবহার করতো। এখানে তাদের সহায়তায় জন্য রাঙ্গামাটি টাউন কমিটির সভাপতি ও রেঞ্জ কর্মকর্তা এগিয়ে আসে। রাজাকার দল বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ মুক্তিকামী জনতা ও নিরীহ লোকদের ধরে এনে নির্যাতন করতো। এরপর নির্যাতিতদের মানিকছড়িতে নিয়ে হত্যা করে নদীতে লাশগুলো ভাসিয়ে দেয়া হতো।

রঞ্জন কুমার সিংহ

বিজয়ের মাসে বিশেষ অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

৮ ডিসেম্বর ২০২২, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্রের ১০৪তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের ২৪ জন যুগ্মসচিব, সেনাবাহিনীর ১জন এবং নৌবাহিনীর ১ জন কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর মেমোরিয়াল মিউজিয়ামস ইন রিমেম্বারেন্স অব দ্য ভিক্টিমস অব পাবলিক ক্রাইমস (আইসিমেমো) এর সাবেক চেয়ারপার্সন ওফেলিয়া লিয়ঁ গত ৭ ডিসেম্বর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এ এম বি শ্যাম সরন ১২ ডিসেম্বর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

Dr. Jose Vinals গ্রুপ চেয়ারম্যান, স্টান্ডার্ড চার্টার্ড পিসিএল ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

৩ ডিসেম্বর ২০২২ ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের একাংশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লিবারেল আর্টস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. ফওজিয়া মান্নান শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা ও চেতনার ধারাকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এই জাদুঘর পরিদর্শনের উদ্যোগ নেন। জাদুঘর পরিদর্শন কর্মসূচির প্রথম অংশে জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'মুক্তির সংগ্রাম' প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা একে একে জাদুঘরের ৪টি গ্যালারি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ীদের স্মারক উপহার দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮জন শিক্ষার্থী ও ২ জন ফ্যাকাল্টি সদস্য জাদুঘর পরিদর্শন করে।

ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর প্রায় চারশত শিক্ষার্থী ২৬ নভেম্বর ২০২২ শনিবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থানের ইতিহাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের তথ্য ও বৈশিষ্ট্য এবং মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনার অন্বেষণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইউল্যাবের জেনারেল এডুকেশন বিভাগ নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই বিশেষ সফরের আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ

১ম পৃষ্ঠার পর

"আমাদের গুলি তো অত সস্তা নয়।" তিনি বাংলাদেশ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে উদাত্ত আহ্বান জানান এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশের তৎপরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ওফেলিয়া লিয়ঁ গণহত্যার স্মরণ ও স্মৃতিচারণ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ গণহত্যা শীর্ষক বক্তব্য প্রদান করেন। ওফেলিয়া লিয়ঁ তার কর্ম মেয়াদে আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রসারণের মাধ্যমে ও বিশ্বব্যাপী গণহত্যা স্মৃতির সুষ্ঠু সংরক্ষণ, এর মধ্য দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। আইসিএমইএমও এর একজন সাবেক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উনি গণহত্যার নির্মম বলি হওয়া ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণের বিষয়টি লালন করেন। ওফেলিয়া লিয়ঁ তার বক্তব্যের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ১৯৭১ সালের গণহত্যা স্মৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। তিনি জানান যে, আইসিমেমো এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মূলত আন্তঃসাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির দ্বারা গণহত্যা রোধ বিষয়ক শিক্ষার প্রসার। তিনি আর্মেনিয়ান, নাৎসি ও বসনিয়ান গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং গণহত্যা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে জাদুঘরের গুরুত্ব তুলে ধরেন। জাদুঘর পরিচালনায় গণহত্যা উত্তরজীবীদের স্মৃতি সংরক্ষণের সংগ্রাম, পরিশ্রম নিয়ে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরার পাশাপাশি জাদুঘর শব্দটির নতুন সংজ্ঞায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, জাদুঘর একটি দেশের ইতিহাসের ধারক ও সমাজ পরিবর্তনের মোক্ষম পন্থা তাই একটি জাতির নিজ সত্তাকে তার প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা জাদুঘর নির্মাণের বিকল্প নেই। তিনি ব্রিটিশ ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি থেকে পাকিস্তানের দুঃশাসন পর্যন্ত ভাষাকে লক্ষ্য করে কীভাবে হত্যা নির্যাতনের নীলনকশা রচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বলেন, "ভাষা যেকোনো দেশের আত্মপরিচয়ের মূল প্রতীক যা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশ গণহত্যা সংগঠনের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল।" ভাষা সংস্কৃতির মূল উপাদান তাই জাদুঘর সংরক্ষণে এটির গুরুত্ব রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ওফেলিয়া লিয়ঁ বলেন, আন্তর্জাতিক জাদুঘর কাউন্সিলের কর্তব্য গণহত্যার বিচার করা নয় বরং গণহত্যার শিকার ব্যক্তিদের স্মৃতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে গণহত্যার স্মৃতিচারণে এর গুরুত্ব তুলে ধরা।" তিনি গণহত্যার স্মৃতি, গণহত্যার শিকার ব্যক্তিগণ ও গণহত্যা উত্তরজীবীদের যথাযথ গুরুত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকৃত ও বাস্তব পর্যায়ে তথ্য আহরণ, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করায় জাদুঘরের অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করেন। গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণ কীভাবে গণহত্যা রোধে ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি আরো জানান যে, আইসিমেমো গণহত্যা রোধের প্রক্রিয়া, গণহত্যা শনাক্তের জন্যে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ও গণহত্যা গবেষণা নিয়ে আন্তর্জাতিক অগ্রগতি নিয়ে কাজ করে চলেছে যা বৈশ্বিক পর্যায়ে গণহত্যা স্মৃতি জাদুঘরের প্রয়োজনীয়তাকে অর্থবহ করে তুলবে। তিনি বাংলাদেশে আইসিমেমোর প্রতিনিধি সংস্থা স্থাপন তথা বাংলাদেশের সাথে আইসিমেমোর যোগাযোগ নির্মাণের বিপুল আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, গণহত্যা স্মৃতি জাদুঘরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার জাদুঘর স্থাপন করাও প্রয়োজন। পরিশেষে তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আসুন আমরা হত্যা বন্ধ করি, আমরা সবাই বৈচিত্র্যকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রাণ, এক পৃথিবী। আসুন আমরা পশুর ন্যায় আচরণ করা বন্ধ করি। যেমনটি উবুন্তু ধারণায় বলা হয়ে থাকে- "আমি আছি কারণ তুমি আছো।" তার বক্তব্যের পর এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ওফেলিয়া লিয়ঁ এর বক্তব্য নিয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। ওফেলিয়া লিয়ঁকে তার বক্তব্যের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সিএসজিজে এর পরিচালক মফিদুল হক। অতঃপর ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীন রচিত ও নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত গণহত্যার ইতিহাসমূলক নাটক 'নিমজ্জন' পরিবেশিত হবার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ইভনাত ভূঁইয়া, গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

মৃত্যুহীন প্রাণ : নৌফেল মারা যায় না

১ম পৃষ্ঠার পর

জেনেছেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলচ্চিত্রটি বানিয়েছেন। তার শ্বশুর কবি আসাদ চৌধুরী অসুস্থ থাকার কারণে তিনি দেশে আসতে পারেননি।'

নির্মাতা নাদিম ইকবালের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়– 'এক বছর পূর্বে মেজবাউদ্দিন নৌফেলের বোন নাজমুন নাহার সাকির সাথে দেখা হয়। সেদিন একদল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দেখা হয়। যারা দেশের মানুষের জন্য, ভাষা-সংস্কৃতি-কবিতা-গান আর অমানবিক অত্যাচারিত-নিপীড়িত-নিগৃহীতদের বাঁচাতে কোনো পিছু টান তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জীবন দিতে। আমাদের স্বাধীন বর্তমান তাঁদের জীবন বলিদানের ফসল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমি ও আমার অযোগ্যতাকে সাথে নিয়ে নেমে পড়লাম বহুবছরের লালিত এক ঋণ শোধ করতে। নৌফেলদের ইতিহাস-চরিত্র-তথ্য-উপাত্ত-সাক্ষী হারিয়ে যাওয়া সহযোদ্ধাদের খুড়ে বের করে আনা আর এগুলোকে পাশাপাশি রেখে সেগুলোকে দেখার ও শোনার এক যোগ্য তথ্যচিত্র নির্মাণ করা এক দুঃসাহসিক কাজ।' বক্তব্যটি পাঠ করেছেন প্রামাণ্যচিত্রের সংগীত পরিচালক শাখাওয়াত হোসেন সাগর।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন– 'নাদিম ইকবালকে খুব মিস করলাম। আমাদের কাছে মনে হয়েছে এই চলচ্চিত্র আলাদা তাৎপর্য বহন করে। এই চলচ্চিত্র যারা তৈরি করেছেন তাদের জন্ম মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে। এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে যে বাস্তবতা ফুটে উঠে তা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ ও বিএনসিসির সম্পৃক্ততা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আমরা দেখি নানাভাবে নানা জায়গায় এটা স্ফুরিত হয়েছে। ফরিদপুরের প্রেক্ষাপটে– নৌফেল সেই সম্পৃক্ততার পরিচয় বহন করেন। আমাদের কাছে ভালো লেগেছে আজকে বিএনসিসির নবীন সদস্য-সদস্যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমার মনে হয় এই ছবির মাধ্যমে বিএনসিসির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একটা সম্পর্ক তৈরি হলো।

সমাপনী বক্তব্যে বিএনসিসির সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাহিদুল ইসলাম খান বলেন– 'আমি কিন্তু সেনাবাহিনীতে এসেছি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। আমার বাবা ও বোন মুক্তিযোদ্ধা। বিএনসিসির মহাপরিচালক থাকাকালীন নাজমুন নাহার আপা আমাকে ফোন করেন নৌফেল সর্ম্পকে জানানোর জন্যে। সেসময় আমাদের সুন্দরবন রেজিমেন্টের ট্রেনিং গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে। আমি আপাকে নিয়ে গেলাম সুন্দরবন। সেই সুবাদে আপার সাথে নাদিমের পরিচয় হয়। নাদিম আমার বন্ধু। আপার সাথে কথা বলার পর নাদিমের চলচ্চিত্রে নৌফেল উঠে আসে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে– আগে বিএনসিসি ক্যাডেট হিসেবে আমরা শুধু শহিদ রুমীকে জানতাম। আর্মির লিস্টে শুধু এগারো জনের নাম রয়েছে। অথচ কত অসংখ্য ক্যাডেট মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। আমরা সেই সব ক্যাডেটদের জানতে চাই, জানাতে চাই। শহিদ নৌফেল সেই সন্ধানী যাত্রার সূচনা।'

শরীফ রেজা মাহমুদ

ভুলি নাই শহীদের কোনো স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর, এই মাসে জাতি হারিয়েছে শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আত্মদানকারী ক'জন বুদ্ধিজীবীর ত্যাগের ঘটনা এবং স্মৃতিচিহ্ন তুলে ধরা হলো 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'র এবারের সংখ্যায়।

শহীদ ডা. আবুল ফায়েজ মোহাম্মদ আব্দুল আলিম চৌধুরী (১৯২৮-১৯৭১)

শহীদ ডা. আলিম চৌধুরী ১৯২৮ সালে কিশোরগঞ্জের খয়েরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ১৯৬৩ সালে মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে প্রধান চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে ঢাকাস্থ স্নাতকোত্তর (মেডিসিন এবং গবেষণা) ইন্সটিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৮ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহন করেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীল নকশার অংশ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর মিলিশিয়া আল-বদর বাহিনী ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীসময়ে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে অন্যান্য অনেক বুদ্ধিজীবীদের মরদেহের সাথে তাঁর মরদেহও পাওয়া যায়।

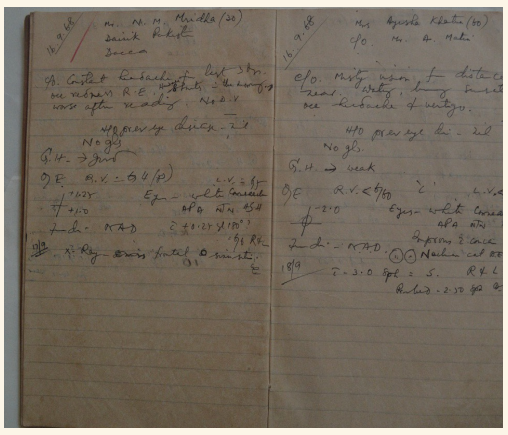

ডা. আলিম চৌধুরী-র পাঞ্জাবি এবং ডায়েরি

দাতা: শ্যামলী নাসরিন চোধুরী

শহীদ ডা. আমিন উদ্দিন

ডা. আমিন উদ্দিন বিসি-এসআইআর-এর কর্মকর্তা ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর সকাল আটটায় আমিন উদ্দিনকে পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। পরে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

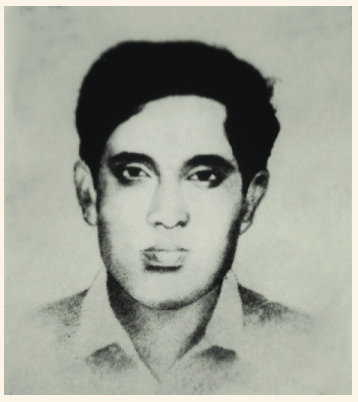

ড. মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন ব্যবহৃত সিজার ও এ্যাশট্রে

দাতা : মো. গাফ্ফার আমিন

শহীদ অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ (১৯৩৩-১৯৭১)

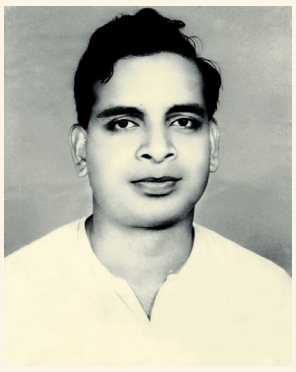

শহীদ গিয়াসউদ্দিন ১১ আগস্ট ১৯৩৩ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে ১৯৫৮ সালে একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সে যান এবং ১৯৬৭ সালে ফিরে আসেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জননন্দিত শিক্ষক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোসর আল-বদর বাহিনী তাঁকে মহসিন হল থেকে ধরে নিয়ে যায়। ৪ জানুয়ারি ১৯৭২ মিরপুর বধ্যভূমিতে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদের পাঞ্জাবি ও মানিব্যাগ

দাতা : সাজেদা বানু

জল্লাদখানায় আগত দর্শনার্থীদের মন্তব্য

ইচ্ছে ছিল অনেক পূর্ব থেকেই বধ্যভূমি ঘুরে দেখার। তাই অদ্য সরেজমিনে দেখে গেলাম। গভীর শ্রদ্ধাচিত্তে সালাম জানাই ১৯৭১ সালে দেশের সকল শহীদদের প্রতি। ঘৃণাভরে ধিক্কার জানাই পাকিস্তানি বর্বর শাসক ও এদেশের পাকিস্তানিদের দোসর আল শামস, জামায়াতের প্রতি। হে মহান রাব্বুল আলামিন আপনি সকল শহীদদের জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।

মো. রফিকুল ইসলাম
আয়কর আইনজীবী, বরগুনা
০৪.১১.২০২২

আলবদর, আলশামস, রাজাকারদের হত্যাযজ্ঞের নিদর্শন হিসেবে বধ্যভূমিতে যে ধরনের আলামত পাওয়া গেছে সেগুলো বিষদভাবে বিশ্লেষণ করে দেশের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। যারা হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল তাদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এই নিদর্শনটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হবে বলে বিশ্বাস করি।

সৈয়দ মুতাসিম বিল্লাহ
১৮.১১.২০২২

আজ জল্লাদখানা বধ্যভূমি মিরপুর ঘুরে দেখলাম। সুন্দর ও পরিপাটিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মেজর কাজী আলমগীর হোসেন
র‍্যাব-৪, মিরপুর
২১.১১.২০২২

মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যার স্থান সমূহের নাম সংরক্ষণ দেখছিলাম, বেদনায় মন ভরে গেল। পাশাপাশি ইতিহাস সংরক্ষণ জাদুঘরের ব্যবস্থাপনা দেখে ভালো লাগলো। জাতির পিতার আহ্বানে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আল্লাহপাকের ইচ্ছায় এখনও জীবিত আছি। আমার সাথে প্রশিক্ষণকালীন থেকে যুদ্ধ চলাকালীন অনেক সাথী ভাইকে হারিয়েছি। অনেক রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা যেন স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারের হাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, এই কামনাই করছি পরম করুনাময় আল্লাহর নিকট। সকল বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রফিকুল ইসলাম ভূইয়া
কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
২১/১১/২০২২

আজ অনেক বছর যাবত বাইরে থেকে দেখি বধ্যভূমি কিন্তু কোনোদিন ঘুরে দেখা হয়নি। আজ ঢুকেই পড়লাম শহীদদের স্মৃতি মনে করে। আমার ভালো লেগেছে তাঁদের স্মৃতিগুলো দেখে। স্মরণ করছি শ্রদ্ধাভরে তাঁদেরকে যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি এ দেশকে। ধন্যবাদ সবাইকে।

রাজিয়া সুলতানা, মিরপুর
২৪.১১.২০২২

এই বধ্যভূমির পাশ দিয়ে অনেকবার যাতায়াত হয়েছে কিন্তু কখনো দেখা হয়নি। আজ কাজ সেরে যাওয়ার পথে প্রবেশ করলাম প্রথম। অনেক অজানা তথ্য জানলাম। সারা দেশের বধ্যভূমিগুলোর একটা তালিকা এখানে পাথরে খোদাই করে লিখে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এত বধ্যভূমির তথ্য জেনে দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারীসহ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁদেরকে পরম শ্রদ্ধাভরে জাতি স্মরণ করবে। পরিষ্কার এবং ছিমছাম এই বধ্যভূমি। এই জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

মোঃ শফিকুল মাওলা
মিরপুর-৭, ঢাকা
২৯.১১.২০২২

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official